কালের কণ্ঠ

তারিখ: 02 JUN 2016

আবুল বারকাত, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ও জামালউদ্দিন আহমেদ

বাজেটে যেসব খাতে বরাদ্দ বাড়ানো

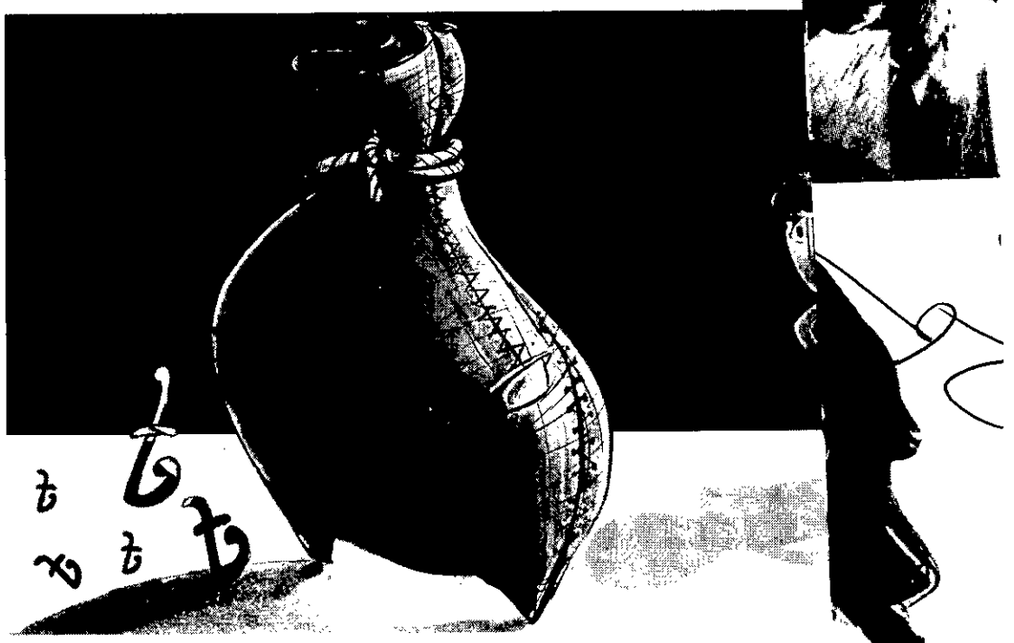

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারাগুলো ক্রমাগত অধিক হারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। সেই সঙ্গে শিক্ষার স্তরভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল ইত্যাদি এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্নভাবে দেখানো উচিত। এ বরাদ্দের আন্তখাত অনুপাত নির্ধারণে মূলধারার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যৌক্তিক করা হোক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই শুরু করা যৌক্তিক

সরকারের বার্ষিক বাজেট রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য পথনির্দেশক দলিল। এটি কোনো অনড়-স্থির প্রক্রিয়া নয়, চলমান-গতিশীল একটি প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনের নিরিখে বাজেটের চলমান-গতিশীল প্রক্রিয়ার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যসহ বিবর্তিত লক্ষ্যটি অনুধাবন অপরিহার্য।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট হওয়া উচিত এমন, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণের সহায়ক হয়। আমাদের সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। নব্য উদারবাদী দর্শনের অধীনে মুক্তবাজারভিত্তিক যে অর্থনৈতিক উন্নয়নপ্রক্রিয়া বাংলাদেশে এখন চালু হয়েছে, তা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের চেতনা উদ্ভূত সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার ও মুক্তবাণিজ্যের রথযাত্রায় আমাদের দেশে আর্থসামাজিক বৈষম্য এরই মধ্যে উঁচুমাত্রায় পৌঁছে গেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। উন্নয়নের এই পথ টেকসই নয়। বিরাজমান বৈষম্যবর্ধক প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সংঘাত-সংঘর্ষ বাড়বে, কমবে না। তাই উন্নয়ন দর্শনে মৌলিক সংস্কার জরুরি। আর এই সংস্কারের মূলমন্ত্র হবে বিরাজমান ও বিকাশমান অ-টেকসই বাস্তবতার বিপরীতে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে সরকারের সব কর্মকাণ্ডে বৈষম্য নিরসনমুখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে।

জাতীয় বাজেট উন্নয়নের দিকনির্দেশক দলিল। সে কারণেই চূড়ান্ত বাজেটে স্পষ্ট হতে হবে যে বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশলসংশ্লিষ্ট যেসব দিকনির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে তার ফলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির কোনটি কী মাত্রায় অর্জিত হবে : বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; অধিকতর কার্যকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি; অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা; শিল্পায়ন : অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্বকর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারি; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার; নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন; বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও মূল্য সংযোজনভিত্তিক সমানুপাতিক হিস্যা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার; মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর; শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নয়, উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবাসহ শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত; সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি; রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর এবং রাষ্ট্রীয়-সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়ন আন্দোলন।

বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমুখী। তবে কাঠামোগত বিন্যাস যেন জনকল্যাণকামী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। সেই সঙ্গে কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল শক্তিশালী করার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য মুদ্রানীতি তথা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি কম রাখার চেষ্টা করতে হবে, তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব মূল্যস্ফীতিতে পড়ারও আশঙ্কা থাকে। এদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি সংযত করবে, নাকি সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতিকে সহায়তা দিতে সুদের হার কমিয়ে রেখে বৃদ্ধি করবে অর্থপ্রবাহ এই 'ট্রেড অফ'-এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের কড়া নজরদারি রাখা উচিত এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে রাজস্বনীতিকে লাগসই করতে হবে।

বরাবরের মতোই বাজেটের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক হলো সময়মতো ও মানসম্মত বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত বাজেট বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রতিটি মন্ত্রণালয়/সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সুচারুভাবে প্রতিপালন করতে হবে; অন্যথা হলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

আসন্ন বাজেটে সামনের অর্থবছরের জন্য মোট প্রকৃত দেশজ উৎপাদনের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হবে হয়তো বা ৬.৫-৭.৫ শতাংশ। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব, যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় যেসব 'অনুমান' উল্লেখ করা হবে, তা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত পদক্ষেপসহ উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পারদর্শিতা বাড়ানো যায়।

আসন্ন বাজেটে বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি হয়তো বা ৭-৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব আসবে। এ প্রস্তাব শর্তাধীন বাস্তবায়নযোগ্য চ্যালেঞ্জ। আমাদের দেশে যেহেতু কৃষি ও কৃষক এখন আর সমার্থক নয়, সেহেতু কৃষকের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে পারে। আর অন্যদিকে সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। শুধু সহায়ক মুদ্রানীতি নয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছুও ভাবতে হবে, যে পথে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে, যে পথে অনেক কর্মসংস্থান বাড়বে এবং একই সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য পাবে, এবং যে পথে বৈষম্য হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি-উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। কৃষক যদি তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পায় সে ক্ষেত্রে ভোক্তাস্তরে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি হয় না; কিন্তু কৃষক তো সর্বস্বান্ত হয় এবং কৃষক পর্যায়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়ে। এ ধাঁধার উত্তর বাজেটে থাকতে হবে। এ দেশে প্রকৃত কৃষক যদি ভর্তুকিসহ অন্যান্য প্রণোদনা না পায় সে ক্ষেত্রে অন্য কারো ভর্তুকি পাওয়ার অধিকার নেই—এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করে বাজেটে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

সব মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিজ নিজ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। দেশের পৌরসভাগুলোয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নে মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং মডেল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোয়ও অনুরূপ মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং মডেল প্রণয়ন জরুরি। এ বিষয়ে রুলস অব বিজনেসের বাস্তবায়ন দরকার।

বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম পথ অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ 'ব্যবসা-ব্যয়' কমিয়ে আনা। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশল নির্দেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বসহ বিবেচনার ক্ষেত্রগুলো হলো শিল্প স্থাপনের জন্য ভূমিপ্রাপ্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল', বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-কাস্টমসসহ দলিল-দস্তাবেজ প্রক্রিয়াকরণ সহজ করা, ব্যবসা-দ্রুতায়নসংশ্লিষ্ট নীতিসহায়ক পদক্ষেপ ইত্যাদি।

রপ্তানি-বাস্কেট বহুমুখীকরণ এবং সেই সঙ্গে যারা উচ্চমূল্যের রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করবে তাদের যুক্তিসিদ্ধ প্রণোদনা প্রদানের বিষয় বাজেট বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। রপ্তানির জন্য নতুন গন্তব্য দেশ অনুসন্ধান উৎসাহিত করতে হবে।

পুঁজিবাজারে ধসের পর সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ফিরে আসা এখনো দৃশ্যমান নয় এবং পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ২০১০ সালের পুঁজিবাজার ধসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কারসাজি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কথা ভাবা যেতে পারে। বিষয়গুলো বাজেটে উল্লেখ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা মূলত ব্যাংকনির্ভর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেটের সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোনো অবদান রাখতে সক্ষম নয়। অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের যৌক্তিক অর্থায়ন যাতে অব্যাহত থাকে সে জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কৃষি খাতের অর্জন ধরে রাখতে নিশ্চিত করা জরুরি যেন কৃষিভর্তুকি হ্রাস না পায় এবং একই সঙ্গে যেন ভর্তুকি-বৈষম্য হ্রাস পায়।

ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় ছাড়া প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে আমাদের নির্দিষ্ট সুপারিশ যে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিশেষত কৃষিসংশ্লিষ্ট উপখাতে পৃথক বরাদ্দ দেওয়া উচিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশলগত কারণে আমরা মনে করি, এ বরাদ্দ হওয়া উচিত কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা।

ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য 'শস্য বীমা', 'কৃষি বীমা', 'জীবিকা বীমা', 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা', 'গবাদি পশু বীমা' ইত্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পথ নির্দেশসহ ব্যয় বরাদ্দ আসন্ন বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

এবারের বাজেটে সম্ভবত গতবারের মতো অতিদরিদ্র বা হতদরিদ্রদের তালিকা প্রণয়নের কথা বলা হবে। মনে রাখা জরুরি যে দারিদ্র্যহার হ্রাস নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। কারণ দারিদ্র্য বহুমুখী। বহুমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা জরুরি। প্রস্তাবিত এই 'দারিদ্র্যের তথ্যভাণ্ডার'-এ দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরনভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম-ঠিকানাসহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, সুপেয় পানির অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের দারিদ্র্য, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য ইত্যাদি। দারিদ্র্যের এ ধরনের তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে চূড়ান্ত বাজেটে বরাদ্দসহ বাস্তবায়নের সময়-নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি বলে আমরা মনে করি।

এ দেশে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য খানার সংখ্যা দুই কোটি, যাদের ৭৫ শতাংশ এ সুবিধা বঞ্চিত। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও তুলনামূলক কম। আমরা মনে করি, জনকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে চূড়ান্ত বাজেটে এ খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি জরুরি। সেই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর সুবিধাপ্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এবং একই সঙ্গে পথ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন যেন সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর 'অন্তর্ভুক্তি ভ্রান্তি' দূর করা যায়। চূড়ান্ত বাজেটে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা জরুরি।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারাগুলো ক্রমাগত অধিক হারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। সেই সঙ্গে শিক্ষার স্তরভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত,